# গোরা উপন্যাসের দেশ, কাল

'গোরা' উপন্যাসটি উনিশশো সাত সাল থেকে উনিশশো দশ সালের মার্চ মাসের মধ্যে লেখা। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীটি শুরু হয়েছে গত শতকের সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে, আঠারো-শ আটাত্তর-উনআশি নাগাৎ। কাজেই বলতে পারি, 'গোরা' নিকট কালের 'ঐতিহাসিক' উপন্যাস। 'গোরা' উপন্যাসে যে সব ঘটনা ঘটছে তা উপন্যাস রচনার বছর তিরিশ আগেকার ঘটনা। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। গোরার জন্ম সিপাহী বিদ্রোহের সময় অর্থাৎ আঠারো-শ সাতান্ন সালে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যখন বিনয় ও গোরার প্রথম পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে, 'কলেজে পাশ করা যখন একটাও আর বাকি রহিল না তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি আর একজন তাহার সেক্রেটারি।' কলেজের সব পরীক্ষায় যখন দুজনেই পাশ করে গেছে তখন তাদের বয়স একুশ-বাইশ ধরে নিলে গোরার ঘটনা শুরু হচ্ছে আঠারো-শ আটাত্তর-উনআশি-তেই।

গোরা ও বিনয় দুজনেই হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে দুর্ঘটনা সূত্রে পরেশবাবু ও সুচরিতার আলাপ হওয়ার পর থেকে বিনয়ের মনে ব্রাহ্ম পরিবারের প্রতি আকর্ষণ জেগেছে বলেই বিনয়-গোরার ঝগড়া চলছে। এই ঝগড়া দিয়েই কাহিনী শুরু হয়েছে। এই ঝগড়ার সূত্রেই আচারনিষ্ঠ গোরা উদার জননী আনন্দময়ীর হাতে খেতে চায়নি—আনন্দময়ী লছমিয়ার হাতে জল খান বলে। বিনয়কেও সে আনন্দময়ীর হাতে খেতে দিতে চায়নি তার জাতের গৌরব রাখার জন্যে। আনন্দময়ী গোরার এই নির্দেশ মেনে নিয়েই বিনয়কে বলেছিলেন, নিজের হাতে তিনি আর বিনয়কে খাওয়াবেন না, বামুন দিয়েই রান্না করিয়ে খাওয়াবেন। বিনয় এই ঘটনায় গভীরভাবে আহত হয়েছিল। আহত হওয়ার আরও একটু ব্যক্তিগত কারণ ছিল। বিনয়ের মা-বাবা নেই। দেশে কাকা আছেন। কলকাতায় বাসা নিয়ে একলাই সে পড়াশোনা করেছে। এবং গোরার সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আনন্দময়ীর স্নেহের টানে আনন্দময়ীকেই সে মা বলে জেনেছে। এই অবস্থায় গোরার আচার-বিচারের বাড়াবাড়ির জন্যে আনন্দময়ীর হাতে সে খেতে পাবে না এটাও তার কাছে খুবই দুঃখের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

এই পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার বোধ তাকে নিঃসঙ্গ করেছিল বলে সে আনন্দময়ীর কাছে দুর্নিবার টানে ফিরে যেতে গিয়ে এক গভীরতর টানে রবিবারের ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে হাজির হয়। সে টানটি আসলে সুচরিতাকে দ্বিতীয়বার দেখবার জন্যেই।



Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে, সময়টা যদি ১৮৭৮-৭৯ হয়, তাহলে তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে একদল ব্রাহ্ম বেরিয়ে এসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা করছেন। এবং, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিত হতে চলেছে। কেশবচন্দ্র তাঁর 'নববিধান'-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন (১৮৮০ সালের ২৬ জানুয়ারি 'নববিধান' ঘোষিত হয়), আর, একটু পরে 'দি নিউ ডিসপেনসেশন' পত্রিকাও (১৮৮১, ২৪ মার্চ) বেরোবে। তাই এই সময় তিনি প্রতি সপ্তাহে নববিধানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। কাজেই উপন্যাসের ঘটনা থেকেও ওই সময়টি মোটামুটি সমর্থিত হচ্ছে।

আর একটি ঘটনা উপন্যাসের ঘটনা-কালকে ইঙ্গিত করে। সুচরিতা ও ললিতা দুজনেই বাড়িতেই পড়াশোনা করেছে। বেথুন স্কুল যদিও আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবু সরকার স্কুলকমিটি ভেঙে দেওয়ায়, স্কুল ভালোভাবে চলেনি। বিশেষত ১৮৭৮ সালের ৩১ জানুয়ারি বেথুন স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষয়িত্রী তৈরি করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত নর্ম্যাল স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নূতন করে বেথুন স্কুল এই বছর আবার শুরু হয় ছাত্রীদের নিয়েই। ঢাকা ইডেন স্কুলও ওই বছরই খুলেছে। এপর্যন্ত, মেয়েরা, বিশেষত প্রগতিশীল জমিদার বাড়ির মেয়েরা, বাড়িতেই পড়াশোনা করেছে। ইংরেজ গভর্নেসও এসে অন্তঃপুরে পড়িয়ে গেছেন। কাজেই সুচরিতা, ললিতাকে নতুন শিক্ষার আলো-পাওয়া মেয়ে হিসেবে দেখা গেলেও তাদের কলেজের ছাত্রী হিসেবে দেখানো হয়নি। দেখালে কালগত অসঙ্গতিই হতো। সুচরিতা অবশ্য কিছুদিন স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। কিন্তু পালিতা কন্যার প্রতি পরেশবাবুর পক্ষপাত বরদাসুন্দরী সহ্য করতে পারতেন না। তাই তাকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতেই পড়ানো হতো।

॥২॥

উপন্যাসের লেখক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁর নায়ক গোরা বছর চারেকের বড়। কাজেই তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের যে ইতিহাসটুকু ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তা ঔপন্যাসিকেরই প্রায় সমকালীন। গোরা যখন মিউটিনির সময় জন্মেছে তারপর থেকে বছর পাঁচেক কৃষ্ণদয়াল তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আনন্দময়ীকে নিয়ে কাশীতেই ছিলেন। তারপর কৃষ্ণদয়াল সপরিবারে কলকাতায় এলেন। আগের পক্ষের ছেলে মহিমকে মামার বাড়ি থেকে আনিয়ে নিলেন। কলকাতার স্কুলে পড়তে পড়তেই গোরা হয়ে গেল ছেলের দলের নেতা। শিক্ষক ও পণ্ডিতদের বিরক্ত করা তার কাজ। একটু বড় হলে ছাত্রদের ক্লাবে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আউড়ে, ইংরিজিতে বক্তৃতা করে গোরা বিদ্রোহীদের (দেশপ্রেমিকদের) দলপতি। কিন্তু বাড়িতে সে তেমন আমল পেতো না। দাদা মহিম গোরা-কে 'পেট্রিয়ট-জ্যাঠা' বা 'হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেন্ড' বলে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। গোরার সঙ্গে দাদার প্রায়ই হাতাহাতি হতো। রাস্তাঘাটে সুযোগ পেলে সাহেবদের সঙ্গে মারামারিও করতো। গোরার এই বিদ্রোহী মনোভাবের পেছনে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ও ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাবই দাদা মহিম দেখতে পেয়েছিল। হরিশচন্দ্র মারা যান ১৮৬১-তে। হিসেব মতো গোরার বয়স তখন চার বছর।

আবার এই দেশপ্রেমিক 'ছোকরাই' কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এদিকে বাবা কৃষ্ণদয়াল তখন হিন্দু ধর্মের আচার নিষ্ঠা পালনে



Scanned with CamScanner

'সাধনাশ্রম' খুলেছেন বাড়িতেই। গোরা বিদ্রোহ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে আনন্দময়ী তাকে আটকান। বোঝা যায়, সিপাহীবিদ্রোহের পরই কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আচার্যপদে থেকে যে বক্তৃতাগুলি দিতেন তাতে তখন কলেজে-পড়া ছাত্ররা দারুণভাবে আকৃষ্ট হতো। ১৮৬২ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের উপদেশ ও বক্তৃতা হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। গোরা ও বিনয়কে যে বক্তৃতা শুনতে যেতে দেখি তা সত্তর-আশির দশকের সন্ধিতেই। বিনয়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু গোরার মধ্যে পরিবর্তন আসে। ছোটবেলা থেকে স্কুলে ও ক্লাবে তর্কে-বিতর্কে গোরার পাণ্ডাগিরি ক্রমে কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনে ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে পৌঁছালো। এদিকে বাবা কৃষ্ণদয়াল হিন্দুয়ানির দিকে ঝুঁকছেন বলে গোরার সঙ্গে বাবার বিরোধ শুরু হলো। বাবার 'সাধনাশ্রমে' যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আসেন তাঁদের সঙ্গে গোরার বিরোধ বাধে। কিন্তু বেদান্তচর্চার জন্যে নিযুক্ত হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পাণ্ডিত্য, ঔদার্য ও সহিষ্ণুতায় গোরা মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম-দর্শনের গভীরে প্রবেশ করে সে হিন্দুধর্মের সমর্থক তো হলোই, খ্রীস্টানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে কাগজে লেখালেখি শুরু করলো। আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'হিন্দুহিতৈষী সভা' স্থাপন করলো বিনয়কে নিয়ে। পরে দেখেছি গোরা 'হিণ্ডুয়িজ্‌ম্' নামে বই লিখেছে। এবং তার রচনাবলি ব্রাহ্ম পরিবারেও পড়া হচ্ছে। তার হিন্দুধর্মের আচার-পালনের মধ্যে গভীর স্বদেশপ্রেম ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ কাজ করতো। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবো, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অন্যধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টি ফুটে উঠছিল, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র 'নববিধান' তৈরি হচ্ছিল। অন্যদিকে, হিন্দুধর্মকে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও চলছিল। ১৮৭২ সালে রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতার বিষয়ই ছিল এই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। এবং এও লক্ষণীয় যে, পরের বছর, ১৮৭৩ সালে কলকাতায় 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'রও প্রতিষ্ঠা হয়। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির চেষ্টায় হিন্দুধর্মের আচার-পালন, প্রতিমা পূজা ইত্যাদির সার্থকতা প্রমাণের ব্যাপারেও উদ্যোগ দেখা যায়। এ সবই খ্রীস্টান প্রচারক ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের তৎপরতারই প্রতিক্রিয়া। কাজেই উপন্যাসে কৃষ্ণদয়ালের হিন্দুয়ানির পেছনে সত্তর দশকের এই 'হিন্দুত্ব'বোধের জাগরণের যোগসূত্রটি স্পষ্টভাবেই চিনে নেওয়া যায়। উপন্যাসে হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতো উদার পরমতসহিষ্ণু পণ্ডিতের ক্ষমাসুন্দর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে গোরা এসে যে বেদান্ত দর্শন পড়তে শুরু করে তার প্রেক্ষাপট হিসেবেও রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন বক্তৃতাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তারও আগে রাজনারায়ণ প্রথম যখন শিক্ষিত বাঙালীকে জাতীয় ভাবোদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ১৮৬১ সালে একটি সভার প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি দেশীয় বা শাস্ত্রীয় প্রথায় শরীরচর্চা, সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, দেশীয় খাদ্যাভ্যাস, বেশ-ভূষা ও আচার-আচরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রতিষেধক হিসেবে। ইংরিজি ভাষাচর্চার আগে মাতৃভাষা ভালো করে শেখা, সংস্কৃত চর্চা করা, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যসংক্রান্ত গবেষণাকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা, দৈনন্দিন জীবনে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার না করে অবিমিশ্র বাঙলা শব্দ ব্যবহার করা, সভাসমিতির প্রতিবেদন বাঙলায় লেখা ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তারই সূত্র ধরে ১৮৭২ সালের বক্তৃতায় তিনি হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের ঈশ্বরচিন্তা-পদ্ধতি ও সামাজিক আদর্শকে খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের চেয়েও উন্নততর বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্মের

Scanned with CamScanner

বর্ণবৈষম্যকে নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার বলেই তিনি রায় দেন। ঐতিহাসিক এবং যুক্তিনির্ভর দৃষ্টি থেকে এই সিদ্ধান্ত কতোখানি গ্রাহ্য সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতিচেতনার ওপর ভিত্তি করেই যে জাতীয় ভাবনাকে রাজনারায়ণ গড়ে নিতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর এই হিন্দু জাতীয়তাকে ভিত্তি করেই নবগোপাল মিত্র ১৮৬৫ সালে 'ন্যাশানাল পেপার' প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৭ সালেই হিন্দুজাতির দেশপ্রেম ও স্বনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে হিন্দুমেলার সূচনা করেন। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত যে চোদ্দটি বার্ষিক মেলা বসে তাতে দেশীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত, দেশজ শিল্পের প্রদর্শনী, দেশজ শরীর-চর্চার ঐতিহ্যকে প্রদর্শনীর মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য প্রাদেশিক শিল্পের নমুনাও এই মেলার 'ভারতীয়' চরিত্রকে প্রমাণ করে।

গোরার জন্ম, মানসিক বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি গত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের সমান্তরাল প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে ব্রাহ্মধর্ম যেমন আভ্যন্তরীণ নানা সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল, হিন্দুধর্ম তার নিজস্ব গৌরব-অভিমানে খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মদের প্রতি সে তুলনায় সহনশীল হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের ঔদার্য পরে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই স্পষ্ট রূপ পেয়েছিল। কিন্তু সে সব ঘটনা 'গোরা'-র ঔপন্যাসিক ঘটনার পরেকার কথা। গোরার ছাত্রজীবনে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের যে নতুন জোয়ার আসে তাতে স্বভাবতই সে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে কৃষ্ণদয়ালের উৎসাহে বাড়িতে যে হিন্দুশাস্ত্রচর্চা শুরু হয় তাতে প্রথমটা গোরা বিদ্রোহী হলেও শেষপর্যন্ত সে এক উদার হিন্দুপণ্ডিতের সান্নিধ্যে এসে হিন্দুশাস্ত্রচর্চায় আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণদয়ালের 'সাধনাশ্রম' খোলা ও হিন্দুশাস্ত্রচর্চা— সবই সমকালীন ইতিহাসে রাজনারায়ণের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা, হিন্দুমেলা ও শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যা এবং আচারপালনেরই ঔপন্যাসিক প্রতিফলন বলে মনে হয়। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছদে গোরা বলেছে, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মতো খাড়া করিয়া বিদেশীর আইনমতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জা পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছু মাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।' এই শপথ ক'রে গোরা গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক শুরু করেছে, টিকি রেখেছে, খাওয়া-ছোঁওয়া নিয়ে বাছবিচার শুরু করেছে। প্রতিদিন সকালে সে বাপ-মার পায়ের ধুলো নেয়, দাদা মহিমকে কথায় কথায় সে যে ইংরিজি ভাষায় 'ক্যাড' ও 'স্নব' বলতো, তাকে দেখলে উঠে দাঁড়ায়, প্রণাম করে। গোরার শিষ্যদেরও বলতে শোনা যায়, 'আমরা ভালো কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে করিতে চাহি না—কেবল আমরা ষোলো আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই।' এ সমস্তই ১৮৬১ এবং ১৮৭২ সালে রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় ভাবোদ্দীপনার প্রস্তাবনা ও বক্তৃতা, নবগোপাল মিত্রের হিন্দু জাতীয়তার পরিপোষক হিন্দুমেলার উদ্দীপনা এবং হিন্দুধর্ম রক্ষায় সনাতন-ধর্মীদের উদ্যোগের সঙ্গে অনায়াসেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। কাজেই গোরার হিন্দু জাতীয়তা সমকালেরই ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি।



Scanned with CamScanner